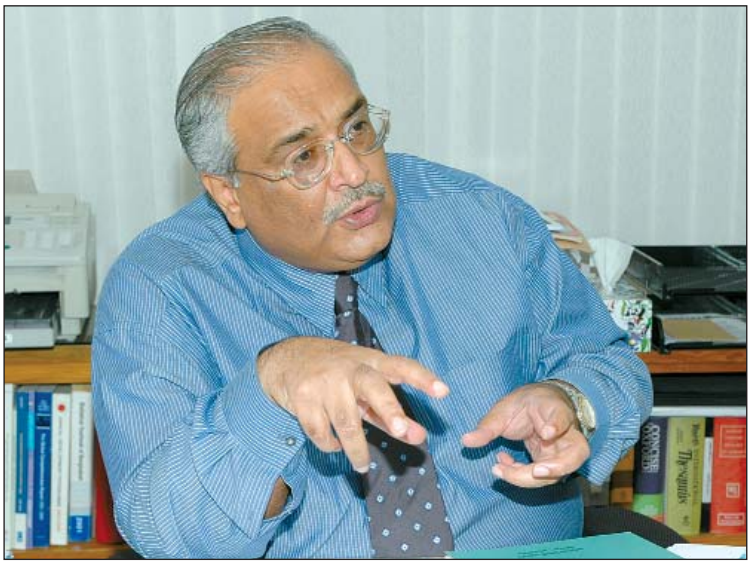

‘আগামী তিন মাস অর্থনীতিকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে’

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ঢাকা

বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। দেশের অর্থনৈতিক হালহকিকত নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে তাঁর কথা হয় গত ১২ সেপ্টেম্বর। অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কিছু সুনির্দিষ্ট পরামর্শও দিয়েছেন তিনি... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাজেদুর রহমান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার কারণে সরকার দেশেও জ্বালানি তেলের দাম বাড়াচ্ছে। এভাবে দাম বাড়ানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প আছে বলে আপনি মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য : বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে দেশের অভ্যন্তরে খুচরা বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে একটা বড় তারতম্যের সৃষ্টি হয়েছে। গত অর্থবছরে বিপিসি লোকসান (ঘাটতি) দিয়েছে প্রায় ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকার মতো। এ বছর তা ৪ থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এটা বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় একটা বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে। গত অর্থবছরেই বাজেটে বাড়তি দেড় হাজার থেকে দুই হাজার কোটি টাকাকে সমন্বয় করা একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পাশাপাশি শুধু জ্বালানিখাতেই আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ২০ শতাংশের চেয়ে বেশি। বর্তমানে মোট আমদানি ব্যয়ের ১২ শতাংশের বেশি এখন জ্বালানি ব্যয়। সব মিলিয়ে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়। সব মিলিয়ে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি অনেকটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তবে এই মূল্য বৃদ্ধির কারণে অর্থনীতির ওপর একটা বড় চাপ পড়ছে, যার নেতিবাচক প্রভাব জীবনযাত্রার মানের ওপর আসে। আমি অবশ্য মনে করি না যে এই মুহূর্তে যতখানি বাড়ানো হয়েছে তা থেকে কম বাড়ানোর সুযোগ ছিলো। পাশাপাশি আমি এটাও মনে করি, অকটেন বা পেট্রলের ওপর আরেকটু বাড়িয়ে ডিজেলের ক্ষেত্রে একটু সদয় হওয়ার সুযোগ ছিলো। আর কেরোসিনের মূল্য তো ভারতের চাইতে আমাদের অনেক বেশি। প্রায় ১৪ টাকার উপরে। কেরোসিনের মূল্য হয়তো কমিয়ে রাখার সুযোগ ছিলো। আমরা এটাকে বলি ‘এনার্জি ক্রস সাবসিডাইজেশন’। অর্থাৎ যে ধরনের জ্বালানি গরিব মানুষ ব্যবহার করে, সে ধরনের জ্বালানির মূল্য কম রেখে অপর পক্ষে যে ধরনের জ্বালানি বড়লোকেরা ব্যবহার করে অর্থাৎ অকটেন পেট্রলের দাম বাড়িয়ে একটা বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ ছিলো। আবার রাজস্ব বাজেটের ভেতর বিভিন্ন খাতে, বিশেষ করে যে থোক বরাদ্দ আছে, সেই থোক বরাদ্দ থেকে সাশ্রয় করে এখানে ভর্তুকি দেয়ার সুযোগ ছিলো। সরকার এ বছর থোক বরাদ্দ রেখেছে ১৭৮২ কোটি টাকা। একই সঙ্গে সেবা ও অন্যান্য খাতে যে বরাদ্দ আছে সেখানেও সাশ্রয় করার সুযোগ রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার সম্প্রতি সাশ্রয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। এ বিষয়ে

সব মিলিয়ে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি অনেকটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তবে জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি আসলে যেকোনো আয়ের মানুষের ওপর একটি ট্যাক্স। সেভাবেই এটি বিবেচিত হবে। বাড়তি ট্যাক্স দিলেই তার প্রকৃত আয় কমে যাবে, প্রকৃত মুনাফা কমে যাবে এবং তার সাধারণ জীবন মানের ওপর একটা প্রতিক্রিয়া হবে

ঘোষণাও দিয়েছে। আমরা আশা করি এটা কার্যকর হবে।

২০০০ : তেলের দাম বাড়ানো অনিবার্য হলে এই অনিবার্য মূল্যবৃদ্ধি মূল্যস্ফীতিকে কতোটা প্রকট করে তুলবে? এর প্রতিক্রিয়া কী রকম হবে?

দেবপ্রিয় : তেলের দাম বাড়ার কারণে প্রথমত উৎপাদন এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এতে সামগ্রিকভাবে যেকোনো ব্যবসা বাণিজ্যিক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় বেড়ে যাবে। বিশেষত জ্বালানি-নির্ভর খাতগুলোয় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কৃষিতে বড় প্রভাব ফেলবে, কারণ কৃষিতে সেঁচ বহুলাংশে ডিজেল-নির্ভর। এতে আমন না হোক বোরো চাষে নেতিবাচক প্রভাবটা বেশি হবে। একইভাবে প্রভাব পড়বে বস্ত্র খাত, সিরামিক, সার (সারের দামের বৃদ্ধিতে কিন্তু কৃষিতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে) এবং পরিবহন বিশেষত স্থলপথের পরিবহনে। এই যে দামটা বাড়ে, সেটা বাজারে স্বয়ংক্রিভাবে স্থানান্তর হয়ে যায়। এতে প্রকৃত ব্যয় বেড়ে গিয়ে মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাবে। মানুষের জীবনযাত্রার মানও নেমে যাবে। এ ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের লোকেরা তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত এবং সীমিত আয়ের লোকের ওপরও বেশি আঘাত আসবে। জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি আসলে যেকোনো আয়ের মানুষের ওপর একটি ট্যাক্স। সেভাবেই এটি বিবেচিত হবে। বাড়তি ট্যাক্স দিলেই তার প্রকৃত আয় কমে যাবে, প্রকৃত মুনাফা কমে যাবে এবং তার সাধারণ জীবন মানের ওপর একটা প্রতিক্রিয়া হবে।

২০০০ : সরকার মূল্যস্ফীতি কমাতে ব্যাংকঋণ সংকোচন ও সুদের হার বাড়ানোর নীতি গ্রহণ করেছে। এ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হবে?

দেবপ্রিয় : বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রা সরবরাহের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র কম। আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক মনে করে, মুদ্রা সরবরাহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব। বিশেষত এই ধারণাটা আইএমএফ খুব গুরুত্ব দিয়েই মনে করে। তারা মনে করে, মুদ্রার সরবরাহ বাড়লে দাম বাড়ে, আর মুদ্রার সরবরাহ কমলে দাম কমবে। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় এই ব্যবস্থা কার্যকর হয় না। একটা উদাহরণ দেয়া যায়। বাংলাদেশের এ মুহূর্তে মূল্যস্ফীতির একটা বড় কারণ জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি। একইভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে সার ও স্টিলের দাম বৃদ্ধি। এসব কারণে সাধারণভাবে আমাদের দেশ যেহেতু আমদানি-নির্ভর, আমাদের

আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি একটা বড় ভূমিকা পালন করে। ফলে মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে এই মুদ্রা সংকোচন নীতি অত বেশি কার্যকর হবে বলে আমার মনে হয় না। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ। কারণ আমাদের দেশে কস্ট পুশ ইনফ্লেশন হচ্ছে, ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন নয়

আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি একটা বড় ভূমিকা পালন করে। ফলে মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে এই মুদ্রা সংকোচন নীতি অত বেশি কার্যকর হবে বলে আমার মনে হয় না। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ। কারণ আমাদের দেশে কস্ট পুশ ইনফ্লেশন হচ্ছে, ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন নয়। আমরা বলি, খরচ বৃদ্ধির কারণে দাম বেড়ে যাচ্ছে। চাহিদাজনিত কারণে হচ্ছে বলে আমাদের মনে হয় না। যদি হয়েও থাকে তবে তা অত্যন্ত মার্জিনাল। তবে সংকোচন নীতির অন্য একটি সুফল হয়তো আসবে। যদি ঋণের ব্যয় বেড়ে যায় অর্থাৎ সুদের হার বাড়ে, তাহলে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা চাপ বা আগ্রহ কমবে। যদি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে আগ্রহ কমে, তাহলে আমদানির প্রয়োজনও কমে যাবে। কারণ ব্যাংকের ঋণ সরবরাহ কমে গেলে, আমদানি প্রবণতা হ্রাস পেলে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর যে চাপ আছে সেটা কমবে। এতে বৈদেশিক লেনদেনের ওপর চাপও কমবে। তাই আমি মনে করি, এই নীতিটা সামগ্রিকভাবে হয়তো ঠিক। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে সেটা কার্যকর হবে না, হয়তো অন্য উদ্দেশ্য কার্যকর হবে।

২০০০ : আপনি একটু আগে বললেন, আমরা আমদানি-নির্ভর, আবার এখন বলছেন আমদানি কমালে সুবিধা হবে। ব্যাপারটা সামগ্রিকভাবে কি ভালো হবে আমাদের দেশের জন্য?

দেবপ্রিয় : বাংলাদেশের মতো একটি দেশে সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা আসলে দক্ষতার বিষয়। ব্যবস্থাপনা সব সময় এক রকম করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অর্থনীতি পর্যালোচনা করে আমদানিকে কখনো উৎসাহিত করতে হবে, কখনো শ্লথ করতে হবে। এখন এটি শ্লথ করার সময়। আবার এটাও দেখতে হবে, আমদানিকে দীর্ঘমেয়াদে শ্লথ করা ঠিক হবে না। তাহলে বিনিয়োগ কমে যাবে।

২০০০ : অর্থনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কতখানি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে?

দেবপ্রিয় : সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যকর করার পূর্বশর্ত হলো বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া। কারণ পিআরএসপির কর্মসূচির আওতায় যে বর্ধিত ব্যয়ের কথা চিন্তা করা হয়েছে তা মূলত আসবে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। কিছু সাহায্য পাইপলাইনে আছে। তবে এ বছর ব্যাপক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য আসার সম্ভাবনা কতখানি, এখন সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা এখন পর্যন্ত কোনো দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাইনি যে, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি যেটা জাতীয়ভাবে গৃহীত হয়েছে সেটার পক্ষে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তারা দেবেন। উপরন্তু, আমরা দেখতে পাচ্ছি দাতারা যেসব ক্ষেত্রে টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেগুলো ছাড় করার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন শর্তের কারণে। আমাদের কাছে মনে হয়, সরকারের বেশ কিছু কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য। এর মধ্যে আসবে সুশাসন, দুর্নীতি কমানো এবং একই সঙ্গে জনগণের নিরাপত্তা ও জনগণের অধিকারবিষয়ক কর্মকান্ড। এগুলোর ব্যাপারে যদি অগ্রগতি না হয়, খুব বড় ধরনের বৈদেশিক সাহায্য আসবে এমন সম্ভাবনা এ মুহূর্তে দেখছি না।

২০০০ : তাহলে তো একটা জিনিস স্পষ্ট হলো, আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা একটা অলীক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেবপ্রিয় : এক অর্থে ঠিক। কারণ পিআরএসপির পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিনিয়োগের প্রয়োজন, যার বড় একটা অংশ বিদেশ থেকে আসার কথা ছিলো। সেই টাকা তো আসতে হবে। আর একটা ব্যাপার, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফসহ দাতাগোষ্ঠীরা মনে করে না যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য যে টাকা বাংলাদেশে আছে সেই টাকা দরিদ্র

জনগোষ্ঠীর হাতে পৌঁছে। এর কারণ হিসেবে তারা মনে করে, বাংলাদেশের সুশাসনের অভাব আছে। সুতরাং সুশাসনের ব্যাপারে তারা যতক্ষণ না নিশ্চিত হবে, ততক্ষণ অর্থ দেয়ার ব্যাপারটাও অনিশ্চিত থাকবে। অবশ্য দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অর্থায়নের কিছু অংশ আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেও আসার কথা। এ উৎসগুলোর ব্যবহারের একটা বড় অংশ ভিজিডি, ভিজিএ কার্ড বিতরণ, ক্ষুদ্র ঋণ প্রভৃতি। দারিদ্র্য বিমোচন ব্যর্থতার আরেকটি বড় কারণ, সরকার যেসব খাতে দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত এবং পরিপূরক, সেসব খাতে সরকার অর্থ দিচ্ছে কিন্তু ব্যয় করতে পারছে না। যেমন স্বাস্থ্য খাত। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় ব্যয়ের হার এডিপিতে গত বছর খুবই নিম্নমানের ছিল। একইভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পারফরমেন্স খারাপ ছিলো। এগুলোতে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী জড়িত। অথচ সরকার এসব খাতে ভালো কোনো অগ্রগতি আনতে পারেনি। এবার এসব উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না দেখার বিষয়। আমি দুটি বিষয় বলেছি দারিদ্র্য বিমোচনে। এক. বৈদেশিক সহায়তা, দুই. অভ্যন্তরীণ খাত। অভ্যন্তরীণ খাতেরও দুটি অংশ। প্রত্যক্ষ খাত ও পরোক্ষ খাত। সমস্যা হলো, যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার কাজ করবে তাদের জন্য নিজস্ব কোনো অবকাঠামো নেই। মানে কার্যকর স্থানীয় সরকার নেই। এই যে ২০-২৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে, এই টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয়ভাবে যে অবকাঠামো দরকার, যে স্থানীয় সরকার দরকার তা এ মুহূর্তে নেই। এটাও দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যর্থতায় বড় ফ্যাক্টর।

২০০০ : এ সরকারকে স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে জবাব আসে যে তারা গ্রাম সরকার গঠন করেছে...

দেবপ্রিয় : গ্রাম সরকার তো কার্যকর কোনো কাঠামো বলে মনে হয় না। একটা স্থায়ী অবকাঠামো দরকার। এ মুহূর্তে ইউনিয়ন পরিষদ কিছুটা পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। তবে আরেকটা স্তর খুবই প্রয়োজন তা হলো, উপজেলা পর্যায়ের একটা কার্যক্রম। অর্থাৎ সত্যিকারের উন্নয়নে ইউপি ও উপজেলা দুটোকেই অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

২০০০ : সপ্তাহের দু'দিন ছুটি অর্থনীতিতে কতটা বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে?

দেবপ্রিয় : এটা তো আমরা সবাই বলছি শুক্র-শনি দু'দিন ছুটির পদক্ষেপ নেয়া ঠিক হয়নি। এই ব্যবস্থা সুবিধার হয়নি। বলা যায়, ভালো করতে গিয়ে খারাপ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি আমরা হিসাব দিয়ে বলেছি ৪০ শতাংশ হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি, বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক সাহায্য ও রেমিটেন্সের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে শুক্রবার একদিন এবং শনি ও রবিবার দু'দিন, যদি আমরা আমেরিকার কথা ধরি তো তিন দিন থেকে সাড়ে তিন দিন বিচ্ছিন্ন থাকবো। এ অবস্থা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না। আদর্শ অবস্থা হলো শনিবার অর্ধদিন এবং রবিবার পূর্ণদিন ছুটি। এ ব্যাপারে জাতীয় ঐক্য আছে বলে আমরা মনে করি। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এটা কেন স্বীকার করে নিতে চান না আমরা বুঝতে পারছি না। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো, যেখানে দুই দলের রাজনৈতিক বিরোধিতা এতো গভীর, আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছে, এ দুই বড় দল একটা বিষয়ে একমত হয়েছে যে শুক্র ও শনিবার ছুটির দিন নির্ধারণে। অথচ যেখানে কাজের জিনিস সেখানে একমত হয় না তারা।

২০০০ : তাহলে এ রকম অর্থনীতির চলমান ও আসন্ন সংকট নিরসনে একজন বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনি কী পরামর্শ দেবেন?

দেবপ্রিয় : এখনই খুব বেশি কিছু বলাটা প্রিম্যাচিউর হবে বলে মনে করি। তবে আমি মনে করি, বিভিন্ন কারণে এ বছর বাংলাদেশের জন্য বিশেষ একটি বছর। এক. দেশের কারণে, দুই. আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে। আন্তর্জাতিক কারণে এই যে তেলের দাম বৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি এবং ইরাক পরিস্থিতিসহ বিশ্বব্যাপী সামগ্রিকভাবে যে অস্থিরতা চলছে, তাতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি একটা অস্থির অবস্থার মধ্যে আছে। একইভাবে দেশের ভেতর রয়েছে মূল্যস্ফীতি। ফলে দেশজ-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এ দুয়ের সহযোগ সামগ্রিকভাবে একটি জটিলতার ইঙ্গিত করে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য। আবার এটা এই সরকারের শেষ অর্থ বছর। এবং নির্বাচনের আগের বছর। যেকোনো সরকারের বেশ কিছু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকে যা পূরণ করার চাপ এড়ানো কঠিন। এখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে যদি রাজনৈতিক অস্থিরতা যুক্ত হয় তাহলে সরকার যে বড় বাজেট, বড় ব্যয়, বড় রাজস্ব আদায়ের কথা চিন্তা করেছে এগুলো কার্যকর করা কষ্টকর হবে। সব মিলিয়ে ইট ইজ এ ভেরি ভেরি ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং ইয়ার ফর দা গভর্নমেন্ট। সরকারের কাছে যে সমাধানগুলো আছে, তাও অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সে কারণে আমি মনে করি, আগামী তিন মাস সরকারকে দেশী ও বিদেশী অর্থনৈতিক প্রবণতাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যেমন- আমনের উৎপাদন কেমন হলো। আমনের উৎপাদনের ওপর নির্ভর করবে আমাদের খাদ্য সমস্যা ও পরিস্থিতি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেলের দাম কতোটা স্থিতিশীল হয় সেটাও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদিও আমার ধারণা, এটি আগামী ২-৩ বছরের আগে ৬০ ডলারের নিচে নামবে বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণও তাই বলছে। বস্ত্র খাতে কোটা উঠে যাওয়ার পরও আমরা রপ্তানি আয় অনেকটা ধরে রেখেছি। তবে আমেরিকার বাজারে কিছুটা পতন হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারেও কিছুটা ক্ষয় হয়েছে। সুতরাং রপ্তানি আয়ের ব্যাপারটা কেমন যাবে সেটাও বোঝার ব্যাপার। সুতরাং বছর শেষে বাজেট পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে সরকার এসে সিদ্ধান্ত নেবে, সরকার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকে নজর দেবে, নাকি প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেবে। অর্থাৎ কোনটা করবে সেটা সরকার এই তিন মাসে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেবে।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**

বছর শেষে বাজেট পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে সরকার এসে সিদ্ধান্ত নেবে, সরকার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকে নজর দেবে, নাকি স্থিতিশীলতাকে ক্ষয় করে প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেবে। অর্থাৎ কোনটা করবে সেটা সরকার এই তিন মাসে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেবে